বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, তেতাল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২/জুন ২০২৫
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v43i.005

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষের অন্বয়

মোঃ মোকাদ্দেস-উল-ইসলাম*

সারসংক্ষেপ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) বাংলা কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম। কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকার কালের তরুণ লেখকদের রচনায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের অস্থিরতা, সংশয়, নাস্তিক্য মনোভঙ্গি, রোমান্টিক বিদ্রোহ ও লোকজ সংস্কৃতির প্রতি অস্বীকৃতিমূলক মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রায় সমকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের মতো তিনি পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার অনুগামী ছিলেন না। প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীরযোগ। একান্ত পরিচিত বিষয়, চরিত্র এবং প্রকৃতির মিশেলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প অসামান্যতা অর্জন করেছে। সাধারণের ভেতরেই তিনি দেখেছেন সৌম্য, শাশ্বত ও পরিপূর্ণ জীবন। প্রায় উনত্রিশ বছর (১৯২২-১৯৫০) তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনকে সমগ্ররূপে দেখেছেন। মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই তিন মিলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যলোক গড়ে উঠেছে। তিনি যে সামগ্রিক জীবনের শিল্পী তার পরিচয় তাঁর ছোটগল্পেই পাওয়া যায়। বর্তমান আলোচনায় তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানুষের অন্বয়সূত্রের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

চাবি শব্দ: প্রকৃতি, মানুষ, ঈশ্বর, ছোটগল্প, সমগ্র জীবনবোধ।

১. ভূমিকা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতিসংলগ্নতা থাকলেও মূলত তিনি তন্বিষ্ঠ মানবপ্রেমিক। তাঁর ছোটগল্পে আড়ম্বরহীন বিচিত্র মানুষের সংযোজনা লক্ষণীয়। তাঁর উপন্যাসের তুলনায় ছোটগল্পে মানুষ প্রাধান্য পেয়েছে কারণ ছোটগল্পে 'বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর দর্শন' সম্ভব হলেও উপন্যাসের দাবি বিশদ জীবনাভিজ্ঞতা। বিচিত্র মানুষের কাহিনিতে সাজানো তাঁর ছোটগল্পের পরিসর নিতান্ত ছোট নয়। প্রকৃতির সমান্তরালে মানুষের প্রতি তাঁর হৃদয়ের উদ্বেল আকুতি, মমতাপূর্ণ ভালোবাসা সর্বোপরি জীবনের প্রতি তাঁর সূক্ষ্ম অভিনিবেশ প্রণিধানযোগ্য। মানুষ ও প্রকৃতির প্রাণপ্রাচুর্যে অবগাহন করতে এবং নিজেকে নবতর জীবনরসে অভিসিঞ্চিত করতেই তিনি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর দিনলিপি ও ভ্রমণবৃত্তান্ত তারই স্বাক্ষর বহন করে। মানুষ ও প্রকৃতিকে জানার অদম্য আগ্রহ নিয়ে 'গোরক্ষা প্রচারণী সংস্থা'র ভ্রাম্যমাণ প্রচারক হিসেবে পূর্ববাংলা (কুষ্টিয়া, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, মংড়ু, সীতাকুণ্ড, আগরতলা, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালি প্রভৃতি) ও আরাকান অঞ্চল এবং উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলার 'বিক্রমখোল' ভ্রমণের বৃত্তান্ত তাঁর *অভিযাত্রিক* (১৯৪১) গ্রন্থে পাওয়া

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

যায়। এছাড়া *বনে পাহাড়ে* (১৯৪৫) দিনলিপিতে ছোটনাগপুর অঞ্চলের সিংভূম, রাঁচি জেলার সারাণ্ডা, কোলাহান প্রভৃতি ভ্রমণ করে অরণ্যের শোভার পাশাপাশি অরণ্যবাসী মানুষের জীবনপ্রণালিও তুলে এনেছেন। তিনি মানুষের সত্যিকার ইতিহাস লিখতে চান। ইতিহাস সাধারণত বিজয়ী বীরদের নিয়ে লেখা হয়। জীবনযুদ্ধে ধ্বস্ত ও বিজিত নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবনের ইতিহাস কোথাও লেখা হয় না, ফলে জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবনগাথাও মহাকালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, এইসব জীবন সাহিত্যে ধারণ করলে সামাজিক ইতিহাস হিসেবে খুব সূক্ষ্ম খাঁটি বিস্তৃত এবং পাকা দলিল হিসেবে মূল্যায়িত হবে। তিনি তাঁর দিনলিপি *অভিযাত্রিক*-এ বলেন: '[...] কিন্তু আরো সূক্ষ্ম আরো তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই। আজকের তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কাবুল যুদ্ধ কি করে জয় করা হয়েছিল, সেসবের চেয়েও খাঁটি ইতিহাস।'[১] এসব তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস লেখা হলে ইতিহাসের যে অপূর্ণতা ও সুগভীর ফাঁক তা পূর্ণতা পাবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাদের জীবনের তুচ্ছ ও সূক্ষ্ম আনন্দ-বেদনার পরিচয় সম্যকরূপে আত্মস্থ করে তাঁর সাহিত্যে ধারণ করার প্রয়াসে। যেসব মানুষের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগেনি, আপাতদৃষ্টিতে যারা তুচ্ছ, অকৃতার্থ, অসফল তাদের প্রত্যেকের বিচিত্র জীবনানুভূতির সন্ধান করেছেন গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বর্তমান গবেষণায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতি ও ঈশ্বরের সম্পর্কের অন্বয় এবং বিধৃত মানুষের বৈচিত্র্যের করণকৌশল অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

২. প্রকৃতি ও ঈশ্বর

ইংরেজি সাহিত্যে প্রকৃতির কবি হিসেবে জর্জ গর্ডন বায়রন (১৭৮৮-১৮২৪), জন কিটস (১৭৯৫-১৮২১), স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ (১৭৭২-১৮৩৪), পার্শি বিশি শেলী (১৭৯২-১৮২২), টমাস স্টেয়ার্নস এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫), উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের কবিতায় প্রকৃতি পরিচর্যার ভিন্নতার মধ্যে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। জর্জ গর্ডন বায়রন যিনি 'লর্ড বায়রন' নামে সমধিক পরিচিত তাঁর কবিতায় প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ উঠে এসেছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো 'Don Juan', 'Childe Harold's Pilgrimage', 'She Walks in Beauty'. জন কিটসকে 'সৌন্দর্যের কবি' ও 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ কবি' বলা হয়। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির সাধারণ রূপ এমন অসাধারণ চিত্ররূপময়তায় উদ্ভাসিত হয় যেন তা পঞ্চইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে। 'Ode to a Nightingale', 'To Autumn', 'Ode on a Gracian Urn' তাঁর বিখ্যাত কবিতা। জন কিটসের কবিতার চিত্ররূপময়তার সঙ্গে বাংলার নির্জনতার কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতার গভীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ তাঁর কবিতায় সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্ব খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর *The Rime of the Ancient Mariner*-এ আলবাট্রস পাখিকে হত্যা করার ফলে গভীর সমুদ্রে নৌকায় অবস্থানকালে এনসিয়েন্ট ম্যারিনারের সঙ্গে ঘটে যাওয়া পাপ (Crime), শাস্তি (Punishment) ও মুক্তির (Salvation) প্রতীকায়িত বহিঃপ্রকাশ অসাধারণত্বের মহিমা বহন করে। পার্শি বিশি শেলী

তাঁর কবিতায় বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা সহযোগে প্রকৃতির প্রবহমানতার রূপের ব্যাখ্যানে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর 'The Cloud' কবিতায় পানি থেকে মেঘের সৃষ্টি, সেটা ঘনীভূত হয়ে আবার বৃষ্টির পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার বর্ণনা কবির বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচায়ক। টমাস স্টেয়ার্নস এলিয়টের কবিতায় প্রকৃতির ধূসর রূপটি উঠে এসেছে। তাঁর বিখ্যাত রচনা *The Waste Land*। তিনি ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রকৃতি-মনস্কতার জন্য ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচিত কবিতাগুলো স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর এবং স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ-এর সম্মিলিত প্রয়াসে প্রকাশিত হয় *Lyrical Ballads* (1798). এছাড়া তাঁর 'The prelude', 'Tintern Abbey', 'Three years she grew', 'Immortality Ode' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির প্রাণবন্ত উপস্থাপনা পাঠকের মর্মমূলে ভাস্বর হয়ে আছে। ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি-চেতনার সাদৃশ্য বিদ্যমান। সমালোচক রামজি লাল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার পরিচর্যা সম্পর্কে বলেছেন:

> In *Tintern Abbey* also Wordsworth traces the development of his love for Nature. In his boyhood Nature was simply a playground for him. At the second stage he began to love and seek Nature but he was attracted purely by its sensuas or aesthetic appeal. Finally, his love for Nature aquired a spiritual and intellectual character and he realized Nature's role as a teacher and educator.[২]

তাঁর কবিতার মধ্যে চারটি পরিচর্যা আছে– প্রথমত, শৈশবের স্মৃতিসমৃদ্ধ প্রকৃতির রূপ তিনি এঁকেছেন তাঁর কবিতায়। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর 'লুসি' ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের 'অপু' সমগোত্রীয়। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভেতরে তিনি বিশ্বশিল্পীকে দেখেছেন, তাঁর কবিতায় সর্বেশ্বরবাদের প্রভাব পাওয়া যায়। বিভূতিভূষণের 'বিশ্বশিল্পী', 'মাকাল-লতার কাহিনী', 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভেতরে বিশ্বস্রষ্টার উপস্থিতির অনুভব সর্বেশ্বরবাদের (Pantheism) প্রভাবের বিষয়টি স্পষ্ট করে। তাঁর 'মড়িঘাটের মেলা' ছোটগল্পে কথকের প্রশ্নের উত্তরে বুনো সাধুর স্পষ্ট উচ্চারণ সর্বেশ্বরবাদের প্রমাণ– '[...] এখানকার গরীব লোকে পয়সা খরচ করে গঙ্গায় নাইতে যেতে পারে না মাঘী পূর্ণিমায়। তাই রটিয়ে দিয়েছি মা গঙ্গা এই মড়িঘাটের গাঙে আসবেন বলেচেন আমার কাছে পূর্ণিমার যোগের দিন। মন শুদ্ধ করে নাইলে এখানেই গঙ্গা! তিনি নেই কোন্ জায়গায়?'[৩] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিনলিপিগুলোতেও তাঁর সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মনের পরিচয় পাওয়া যায় :

ক. 'নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর একটি রূপসৃষ্টি।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।'[৪]

খ. 'আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তাঁর এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্য দিয়ে।'[৫] তৃতীয়ত, প্রকৃতির মধ্যে তিনি শুশ্রূষার শক্তি দেখেছেন; ধ্বস্ত, আহত ও ক্লান্ত প্রাণে নিবিড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে

এর অন্তর্নিহিত শক্তি আত্মস্থ করলে প্রশান্তি অর্জনের সম্ভাব্যতার কথা বলেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মাঝে অবগাহনের মাধ্যমে 'Tranquil Restoration' বা 'প্রশান্তি পুনরুদ্ধারে'র কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকৃতির মাঝে যে প্রশান্তি আছে তা প্রকৃতির সান্নিধ্যে না গেলে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শহুরে যান্ত্রিক জীবন ও সভ্যতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেছেন: 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' এ যেন প্রকৃতির বুকে আশ্রয়ের জন্য লালায়িত ও দুর্বিষহ নাগরিক জীবনের প্রতি সংক্ষুব্ধ প্রাণের মর্মান্তিক আত্ম-চিৎকার। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতির মাঝে প্রতিনিয়ত বিচরণের আপ্রাণ আকাঙ্ক্ষা না থাকলেও 'কবি' গল্পে রঘুনাথ দাসের সাহিত্যচর্চার কুটির দেখে জায়গাটি কিনে সেখানে বসবাসের ইচ্ছাপোষণ করেন। কিন্তু গ্রামে নাগরিক সুবিধার অভাবহেতু পরবর্তী সময়ে দমে যান। গ্রামে প্রকৃতি থাকলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো নগরকে গ্রামে রূপান্তরিত করার অলীক আশাবাদ ব্যক্ত করেননি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দিনলিপিতে ক্লান্ত মনের শুশ্রূষার জন্য একা প্রকৃতির মাঝে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। দিনলিপি *অভিযাত্রিক*-এ তিনি বলেন:

> প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতির রানী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়। চুপ করে বসে থাকতে হয়, একমনে ভাবতে হয়, মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে আপনিই কত ভাবনা এসে পড়ে। [...] এমন কি সঙ্গে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না।[৬]

চতুর্থত, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কবিতায় প্রকৃতিকে নৈতিক শিক্ষক হিসেবে আবিষ্কার করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রকৃতিকে শিক্ষকরূপেই দেখেছেন। তিনি তাঁর দিনলিপি *অভিযাত্রিক*-এ বলেন– 'আমার এই দৃঢ় ধারণা, যে দেশভ্রমণ করেনি, প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে দেখেনি, কোথাও বা মোহন, কোথাও বিরাট বা কোথাও রুক্ষ ও বর্বর–তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে অনেক বাকি।'[৭] উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতই তিনি প্রকৃতির ভেতর সাধারণ সৌন্দর্য, ঈশ্বরের মাহাত্ম্য, শুশ্রূষার গুণ ও শিক্ষার উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে উইলিয়াম হেনরি হাডসন-এর *Green Mansion's* (1904), নাট হামসন-এর *Pan* (1894), হেনরি ফ্রেডরিখ এমিল-এর *Amiel's Journal* (1913), বিখ্যাত শিকারী জিম করবেটের *Jungle Lore* (1935) উপন্যাসের মূলগত চেতনার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে মানুষের সমান্তরালে প্রকৃতি-চেতনার প্রয়োগ অর্বাচীন নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে প্রকৃতির উপস্থাপনা দুষ্প্রাপ্য নয়, কিন্তু তা শিল্পীর সচেতন সত্তায় জারিত না হওয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেনি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোমান্টিক প্রকৃতি-চেতনার দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) কথাসাহিত্যে প্রকৃতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাঁর *কপালকুণ্ডলা* (১৮৬৬), *আনন্দমঠ* (১৮৮২) ও *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪) উপন্যাসে প্রকৃতির প্রক্ষেপণ ঘটেছে। পটভূমি ও প্রতিবেশ তৈরিতে প্রকৃতির ব্যবহার দেখা যায় *আনন্দমঠ* ও *দেবী চৌধুরাণী* উপন্যাসে। *কপালকুণ্ডলায়* মানুষ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, এখানে কপালকুণ্ডলা মূলত প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে বেড়ে উঠেছে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) কাব্যেও প্রকৃতি-চেতনা আছে, কিন্তু তা অস্বচ্ছতার বেড়াজালে আবদ্ধ। প্রকৃতি তার সর্বৈব সত্তা নিয়ে আবির্ভূত

হয়েছে, মুক্তি পেয়েছে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কাব্য ও ছোটগল্পে। বিশেষত তাঁর পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত ছোটগল্পগুলোতে প্রকৃতি বিচিত্র সত্তায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে। জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কাব্যেও প্রকৃতি তার ফুল-দল মেলে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থে যুগপৎভাবে ধূসর এবং সজীব ও প্রাণবন্ত প্রকৃতির সহাবস্থান প্রকৃতিভাবনায় নবতর মাত্রা যোগ করেছে। প্রকৃতিপ্রীতি ও প্রকৃতির প্রতি দুর্বার মোহনীয় আকর্ষণ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। গ্রামীণ জীবনে অভ্যস্ত ও প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিপ্রীতিই তাঁর শিল্পী মানসকে কল্লোল গোষ্ঠী থেকে বিচ্যুত করে রবীন্দ্রানুসারী হিসেবে গড়ে উঠতে প্রণোদিত করেছে। তাঁর প্রকৃতি মানব-বর্জিত নয়। আদিবাসী ও অরণ্যচারী সরল মানুষ, শিশু ও গ্রামীণ মানুষ প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ। বাংলার মানুষ ও প্রকৃতির যৌথরূপের নিখুঁত চিত্রায়ণে তাঁর ছোটগল্পসমূহ কালোত্তীর্ণ মহিমা লাভ করেছে। *স্মৃতির রেখা* (১৯৪১) দিনলিপিতে মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক–বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র বাংলার সন্ধ্যাসকাল আকাশ-বাতাস, ফল, ফুল–বাঁশবনের আমবাগানের নিভৃত ছায়া ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে–তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখ দুঃখকে রূপ দিতে হবে।[৮]

রবীন্দ্রানুসারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র রচনায় প্রকৃতির নির্মোহ রূপায়ণ ঘটলেও তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতি চিত্রায়ণ গৌণ হয়ে উঠেছে, সেখানে মুখ্য মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের প্রকৃতি-চেতনার সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-ভাবনার পার্থক্য বিদ্যমান। 'বিমূর্তন রবীন্দ্রসাধনার প্রবণতা–বিভূতিভূষণ জীবনরস-পিপাসু। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় পদ্মা শেষে 'বলাকা'র বিরাট নদী'তে পরিণত; বিভূতিভূষণের আদিতেও ইছামতী, অন্তেও সেই ইছামতী।'[৯] রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃতি-ভাবনায় অনুপ্রাণিত হলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে তাঁর কবিচিত্ত পাঠককে আনন্দময় সৌন্দর্যলোকাভিসারী করে এক নির্জন মায়াময় আবহে পৌঁছে দেয়, যা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনা থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেন– 'মানবিক সত্যের সাথে প্রাকৃতিক সত্যের মিশেল দিয়া গল্পগুলিকে কবিত্বরসে সমৃদ্ধতর করিয়া তুলিয়াছেন।'[১০] রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতির সচেতন প্রয়োগ তাঁর গল্পের কাহিনি বা চরিত্রের পরিণতিকে প্রভাবিত করেছে। যেমন : যেসব গল্পে বৃষ্টির দৃশ্য বা পটভূমি সংযোজিত হয়েছে সেগুলোর নিষ্পত্তিতে অনিবার্যভাবে ট্রাজিক রসের উৎপত্তি হয়েছে। 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি', 'মধ্যবর্তিনী', 'জীবিত ও মৃত' প্রভৃতি গল্পে বৃষ্টির আবহ এরই সাক্ষ্য বহন করে। এছাড়া বিভিন্ন গল্পে 'বৃক্ষ' ও 'অন্ধকারে'র উপস্থাপনা গল্পের কাহিনির পূর্ণতাব্যঞ্জক সংকেত দান করে। অন্ধকারের সাথে মানবমনের মিথস্ক্রিয়া লক্ষ করা যায় 'সমাপ্তি' গল্পে–'মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল;'[১১] এবং 'অন্ধকার অজ্ঞাতসারে এমন এক গীতময় সঞ্চরণশীল আবহ সৃষ্টি করেছে, যা অবিকশিত স্বামীবিমুখ মৃন্ময়ীর অপূর্ব-বিশ্বাস, সারল্য ও আকাঙ্ক্ষাকে সংগোপনে সম্ভাবিত করেছে।'[১২]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে এরকম মানুষ ও প্রকৃতি মিশে একীভূত হয়নি, প্রকৃতি এসেছে বিক্ষিপ্তভাবে, সেখানে গভীর কোনো দ্যোতনা সৃষ্টি করেনি, প্রকৃতি শুধু গল্পের প্রতিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কনে দেখা' গল্পে ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যায়। গল্পের নায়ক হিমাংশু তার প্রিয় এরিকা পাম গাছটিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করে। এরিকা পাম গাছটিকে অন্যের বাড়িতে দেখতে গিয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখতে পায়। তখন অনুভব করে, 'ও যেন বলছে, আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয়তো এখনও বাঁচবো! ছেড়ে যেও না এবার! আমায় বাঁচাও!'[১৩] বাসায় ফিরে রাতে ভালো ঘুমাতে পারে না হিমাংশু। পরদিন এরিকা পাম গাছটিকে উদ্ধার করে প্রসন্ন চিত্তে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার একে বিয়ে দেওয়ার সাধ জাগে। হিমাংশু বলে– 'তাই অল্প বয়সের, দেখতে ভালো পাম খুঁজছিলাম। হি-হি–পাগল নয় হে পাগল নয়, ভালোবাসার জিনিস হোতো তো বুঝতে।'[১৪] এরকম অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা সাধারণ মানুষের বুঝতে কষ্ট হলেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বৃক্ষপ্রেমিক তথা প্রকৃতিপ্রেমিকের পক্ষে অনায়াস সাধ্য।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতিমুগ্ধতা যে একেবারে নেই তা নয়, যেসব গল্পে প্রকৃতির মোহনীয় রূপের মুগ্ধতার প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে মানুষের জীবন নেই, শুধু প্রকৃতির দর্শন ঘটেছে ('বিক্রমখোল', 'প্রভাতী', 'মানতালাও', 'ছোটনাগপুরের জঙ্গলে' প্রভৃতি গল্পে) ফলে কোনো সরস কাহিনিবৃত্তও তৈরি হয়নি। গল্পকার যেখানেই প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছেন, সেখানেই অপূর্ব মহান শিল্পীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি ঈশ্বরভাবনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। 'নব-বৃন্দাবন' গল্পে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত কর্ণপুর বৃন্দাবন যাওয়ার পথে এক শিশুকে কুড়িয়ে পেয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার আশা ত্যাগ করে পুনরায় গৃহী হয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসে এবং শিশুটিকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার ব্রত গ্রহণ করে। গল্পের শেষে সে কৃষ্ণের বাঁশির তান শুনতে পায়। গৃহী কিংবা সন্ন্যাসীর চেয়ে বড় হলো মানবধর্ম, কর্ণপুর মানবধর্ম পালন করেছিল তাই গৃহী হয়েও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিল। ঈশ্বরের কৃপায় দুশ্চরিত্র হরিপ্রাণ মুখুজ্জের ধর্মপ্রাণ সাধুতে রূপান্তরিত হওয়ায় গল্প 'হরিকাকা'। 'বিশ্বশিল্পী' গল্পে গল্পকার প্রকৃতির সাধারণ বন্যলতার সৌন্দর্যের মধ্যে পরম ব্রহ্মের আস্বাদ লাভ করেছেন। পরম সত্তা রস উপভোগ করে আনন্দ পান। রস উপলব্ধি করার জন্য প্রয়োজন দ্বৈতভাব, চাই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের জাগতিক বা বস্তুতান্ত্রিক জগৎ এবং সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন বহু মানুষের মন। এই দ্বৈতের মিলন, পরিচয় ও প্রীতি অবলম্বনেই রসের ধারা প্রবাহিত হয়। যেখানে একক সত্তা বা দ্বিতীয়হীন সত্তা বর্তমান, সেখানে রস বয় না, সেখানে আনন্দ উপলব্ধির অবকাশ নেই। তাইতো গল্পকার বলেন : 'পরম ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্তা বহন করে এনেচে ওই বন্যলতা লোক-লোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের এই অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুলুনিতে–ওর মধ্য দিয়েই তাকে প্রত্যক্ষ কর।'[১৫] বৃহদারণ্যকে বলা হয়েছে–

> [...] একদা একা থাকলেও তিনি একাকিত্ব উপভোগ করলেন না; তাই রসের উপলব্ধির জন্যই তিনি বহু দ্বারা খণ্ডিত তাঁর বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করলেন, তিনি বিশ্বরূপ হলেন।
> [...] প্রথম অবস্থায় ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়রূপে ছিলেন: কিন্তু একা থাকলে যে তাঁর রসোপলব্ধি হয় না, তাঁর আনন্দরূপ প্রকট হয় না। তাই একা একা তাঁর ভালো লাগল না। সেই কারণেই তিনি দুয়ের ভিত্তিতে প্রকাশ নিতে চাইলেন; তিনি দ্বিতীয়কে চাইলেন। তখন তিনি নিজেকে বহুতে রূপান্তরিত করলেন। তখন জ্ঞাতা এল, জ্ঞেয় এল; দ্রষ্টা এল, দৃশ্য এল; শ্রোতা এল, শ্রোতব্য এল; ঘ্রাতা এল, ঘ্রাতব্য এল; এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধে-ভরা বিচিত্র বিশ্ব এল।[১৬]

'মাকাল-লতার কাহিনী' গল্পেও মাকাল ফল ও লতার সৌন্দর্যে বিমুগ্ধপ্রাণ গল্পকার প্রকৃতির অনাবিল রূপের মধ্যে ঈশ্বরের অপার সৌন্দর্য বিভা আবিষ্কার করে ঔপনিষদিক আনন্দ লাভ করেছেন। প্রকৃতি-চেতনার সমান্তরালে গল্পকারের অন্তর্লোকে সতত বিরাজমান ছিল ঈশ্বর-বিশ্বাসের অখণ্ডতা।

৩. মানুষ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে কৈশোর, যৌবন, বৃদ্ধ মানবজীবনের এই ত্রিক্ষেত্রের প্রতিই সমান আলো ফেলেছেন। 'তাঁর গল্প নিতান্তই কতকগুলি অকিঞ্চিৎকর নরনারীর কাহিনী– 'Short simple annals of the poor'।'[১৭] তাঁর ছোটগল্পে চরিত্র হিসেবে কোনো রাজা বা উচ্চবংশীয় মহৎ মানুষের জীবন কড়চা নেই বরং খুবই সাধারণ দরিদ্র অথচ কর্তব্যপরায়ণ স্কুল মাস্টার, দারিদ্র্যপীড়িত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, সহৃদয় মমতাময়ী নারী, গ্রাম্য মুখরা হৃদয়হীন রমণী, অবোধ শিশু-কিশোর, অবহেলিত আদিবাসী শ্রেণি, বিদেশি উপকারী বন্ধু, ফিরিওয়ালা, ক্যানভাসার, সমাজে অস্পৃশ্য হিসেবে পরিচিত পতিতা প্রভৃতির কারুণ্যে ভরা জীবনের গভীর স্বপ্ন, হতাশা, সততা, ক্লেদ, দারিদ্র্য, অর্থলোলুপতাকে সহজাত মমত্ব নিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

৩.১

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনেক ছোটগল্প একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। চরিত্রগুলো গল্পকারের ব্যক্তিগত বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকেই সংগৃহীত এবং কল্পনার সংমিশ্রণে পরিবর্ধিত। এসব চরিত্র জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিক, এদের জীবন দুঃখ-দারিদ্র্যে গ্লানিময়, সাফল্যহীনতায় পর্যবসিত। বিভূতিভূষণ সহৃদয় মমতা নিয়ে তাদের অকৃতার্থতার গল্প বলেছেন। তেমনি কিছু অচরিতার্থতার গল্প হলো: 'রামতারণ চাটুজ্জে–অথর', 'কবি কুণ্ডুমশায়', 'অনুসন্ধান', 'শাবলতলার মাঠ', 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি', 'উইলের খেয়াল', 'যদুহাজরা ও শিখিধ্বজ', 'বিধু মাস্টার', 'বেচারি', 'জন্ম ও মৃত্যু', 'উল্টোরথ', 'বড়দিদিমা', 'ঝগড়া'। রামতারণ চাটুজ্জে এককালে স্কুলের ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচয়িতা হলেও কালক্রমে দারিদ্র্যকবলিত হয়ে পড়েন। কবি কুণ্ডমশায় মনেপ্রাণে কবি হয়েও সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে না পেরে কাপড়ের দোকানের কর্মচারী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। 'অনুসন্ধান' গল্পে একজন কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ শিক্ষক নারাণবাবুর নিদারুণ দারিদ্র্যের প্রতিচিত্রণ লক্ষণীয়। 'শাবলতলার মাঠ' গল্পের প্রধান শিক্ষক উমাচরণ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হলেও কবিতা লিখে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। 'ভণ্ডুলমামার বাড়ি' গল্পে ভণ্ডুলমামার সারাজীবনের সাধ একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই তার সমস্ত সঞ্চয়

দিয়েও পূর্ণ করতে পারে না। 'উইলের খেয়াল' গল্পে বৃদ্ধ বয়সে পিসিমার সম্পত্তি প্রাপ্তির মাধ্যমে পূর্ণবাবুর দারিদ্র্যের অবসান ঘটে, কিন্তু সেই সম্পত্তি ভোগ করবার মত শারীরিক সক্ষমতা তার চলে যায়। গল্পকারের ভাষ্য মতে :

> দেখলাম পূর্ণবাবু চিরবঞ্চিত জীবনের সর্বগ্রাসী তৃষ্ণার ভোগলালসা মেটাতে উদ্যত হয়েচেন বিকারের রোগীর মত। চারিধারে ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে, স্বল্পতৈল জীবনদীপের আলো যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর জোতিঃবৃত্তের সৃষ্টি করচে, উনি ততই উন্মাদ আগ্রহে যেখানে যা পাবার আছে পেতে চান–যা নেবার আছে নিতে চান। জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়ে তখন আধ-মরা, সেই এল কিন্তু এত দেরি করে ফেললে![১৮]

'যদুহাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পে এককালের জনপ্রিয় যাত্রাশিল্পী 'যদুহাজরা' কালের পরিক্রমায় জৌলুস হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে অনাদরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। 'বিধু মাস্টার' গল্পে এক দরিদ্র মাস্টারের চাকরি চলে যাওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'বেচারী' গল্পে ভগ্নিপতির গলগ্রহ হয়ে থাকা সুরেশের মনোবেদনার চিত্র উঠে এসেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য চিরকাল পীড়িত করেছে। মানুষের প্রতি একটা সহজাত ভালোবাসা-মমতা তাঁর মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখতো। *স্মৃতির রেখা* (১৯৪১) দিনলিপিতে এ সম্পর্কে বলেন :

> যে বুড়ীটা গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটালাথি খেয়ে কিছুদিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবে মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে–জগতের পবিত্র কারুণ্যের আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অন্তরের অনাহত ধ্বনি কানে বাজবে। যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি সে অতি দুর্ভাগ্য। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে।[১৯]

'জন্ম ও মৃত্যু' গল্পে গল্পকার যেন সেই অদ্ভুত জীবনরস খুঁজে পেয়েছিলেন। এখানে জীবনে প্রতিষ্ঠিত বৃদ্ধ বিশ্বনাথ বাবুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনের সমান্তরালে দারিদ্র্যপীড়িত বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুনের শ্রাদ্ধের আয়রনি চিত্রিত হয়েছে। বেঁচে থাকতে শশী-ঠাকরুনের ছেলেরা শহরে ভালো চাকুরি করে মোটা মাইনে পেলেও কেউ তার খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। বুড়ির মরণকালে কেউ দেখতে আসেনি। বড়ছেলে সাধ্যমতো বুড়ির সেবাযত্ন করার চেষ্টা করেছিল। বুড়ি ছেলের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। বড়ছেলে সিধুকে ডেকে নিয়ে তার শ্রাদ্ধে বেশি খরচ না করতে, অন্য ভাইরা যদি কিছু দেয়, সেখান থেকে কিছু টাকা ছেলে-পিলের ভবিষ্যতের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে পরামর্শ দিয়েছিল। বুড়ি মরার দুই ঘণ্টা আগে বড় ছেলের বৌকে বলেছিল :

> বৌমা, লেপটা সরিয়ে নাও, চার-পাঁচ টাকা দামের লেপটা–আমি বাঁচব না, তখন ওটা আমার সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ও গেলে আর হবে না বৌমা। আহা, কোথায় পাবে সিধু যে, আবার চার-পাঁচ টাকা খরচ করে লেপ বানাবে? শীতকালে বাছারা আমার আদুড় গায়ে কাটাবে তা হলে।[২০]

শশী-ঠাকরুন বেঁচে থাকতে তার ছেলেরা আসেনি অথচ মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধে ঘটা করে প্রচুর টাকা খরচ করেছিল। বিশ্বনাথবাবুর সাথে শশী-ঠাকরুনের জীবনের যে বৈপরীত্য ও শশীর ছেলেদের স্বার্থপরতার দিকটি প্রকটিত করে তুলেছেন গল্পকার। 'উল্টোরথ' এককালের

দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সত্য চক্রবর্তীর, ছোট ছেলের ভয়ে বৃদ্ধ বয়সে গুটিয়ে যাওয়ার গল্প। 'বড়দিদিমা' গল্পে সবাই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেলেও বৃদ্ধা বড়দিদিমা মৃত স্বামী-সন্তানের সুখস্মৃতি নিয়ে পাষাণী অহল্যার মত স্বামীর ভিটে পাহারা দেয় ও মৃত্যুর প্রহর গোনে। 'ঋগড়া' গল্প বাহাত্তর-তিয়াত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ কেশব গাঙ্গুলীর হৃদয়বিদারক মৃত্যুর আলেখ্য। কেশব গাঙ্গুলী যৌবনে রেলে চাকরি করত, অবসর গ্রহণের পর তার সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে স্ত্রী মুক্তকেশীর নামে চার হাজার টাকা ও ছোট মেয়ে ময়নার নামে তিন হাজার টাকা লিখে দেয়। নিজের জন্য কিছুই রাখার প্রয়োজন সে মনে করেনি। পকেট খরচের জন্য কোনো টাকা স্ত্রীর কাছে চাইলে ঋগড়া হতো। স্ত্রী-কন্যারা তাকে কেউ প্রাপ্য সম্মান দেয় না, চোর সাব্যস্ত করে, যত্ন করে না। ছোট মেয়ে ময়না তাকে একটা ভাঙা ছাতির বাঁট তুলে মারতে যায়, মেজ মেয়ে তার মৃত্যু কামনা করে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে কেশব গাঙ্গুলী ঋগড়া করে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। সারারাত চণ্ডীমণ্ডপে মশার কামড় খেয়ে শুয়ে থাকলেও ম্যালেরিয়াশীর্ণ বৃদ্ধের প্রতি স্ত্রী-কন্যাদের মায়া হয় না। সব অপমান ভুলে বাড়ি ফিরলে স্ত্রী-কন্যাদের হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতায় হত-বিহ্বল কেশব গাঙ্গুলী শেষবারের মত বাড়ি থেকে চলে যায়। সব থেকেও নেই কেশব গাঙ্গুলীর, এই আত্মীয়হীন অমানবিক আবহ সহ্য করতে না পেরে সে অপমানিত ও নিগৃহীত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। মানব জীবনের শেষ অধ্যায়ের দুঃখ, দুর্দশা ও লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনাবলি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরীভূত হয়েছে এবং হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছে। তাই তাঁর ছোটগল্পে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অপরদিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় শতাধিক গল্পের একটিতেও বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবনের অন্তিম সময়ের কারুণ্যের দশা প্রতিচিত্রিত হয়নি।

৩.২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামের প্রতি আমৃত্যু টান ছিল। শৈশবের নস্টালজিয়াই এই চিরশিশুকে গৃহমুখী করেছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ছোটগল্পে গৃহে প্রত্যাবর্তনের গল্প এসেছে। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস', 'সিঁদুরচরণ', 'সীতানাথের বাড়ী ফেরা', 'বুধীর বাড়ি ফেরা', 'প্রত্যাবর্তন' হলো তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তনের গল্প। 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পের ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্টা, ধর্মান্ধ 'দ্রবময়ী' কাশীপ্রাপ্তি বা স্বর্গলাভের আশায় কাশী গেলেও নিজের গ্রামের পরিচিত আবহ ও ঘরোয়া জীবনের নিবিড় স্নেহের আবেশকে বিস্মৃত হতে পারেননি। গৃহপ্রীতির কারণে গুরুদেবের ধর্মবয়ান শুনে তার মনটা নরম হয় না বরং বাড়িতে ফেলে আসা গরু মুংলির শারীরিক অবস্থার কথা মনে পড়ে এবং অস্থিরতা বাড়ে। নিজের স্বামীর ভিটেতে প্রত্যাবর্তনের পর দ্রবময়ীর উপলব্ধি– '[...] কাশী পেরাপ্তিতে দরকার নেই–এই ভিটেই আমার গয়া কাশী। তিনি এই উঠোনের মৃত্তিকেতে শুয়েছিলেন ওই তুলসীতলায়–আমাকেও তোরা ওখানে–'।[২১] 'সীতানাথের বাড়ি ফেরা' ও 'সিঁদুরচরণ' গল্পে গৃহে প্রত্যাবর্তনের যে অপার আনন্দ ও সুখ তারই চিত্র উঠে এসেছে। 'প্রত্যাবর্তন' নামে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি গল্প আছে। 'প্রত্যাবর্তন' গল্প দুটিকে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের সাথে মিলিয়ে পড়া যায়। একটি 'প্রত্যাবর্তন' গল্পের কথক

বিনোদ আরেকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র গোবিন্দ। 'ছুটি' গল্পে ফটিক যেমন তার মামীর নিষ্ঠুরতার শিকার; তেমনি গোবিন্দ তার কাকিমার ও বিনোদ খুকির মার নিষ্ঠুরতায় বিপর্যস্ত। ফটিক তার মার কাছে ফিরে যেতে পারেনি বিনোদও তেমনি মাঝপথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিল। নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের সাধ তাদের পূর্ণ হয়নি। গোবিন্দ কিন্তু পালিয়ে নিজ গৃহে মায়ের কোলে ফিরে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে।

৩.৩

গল্পকার মায়ের এই প্রীতি, স্নেহ এবং বোনের ভালোবাসার নিগড়ে বাঁধার কাহিনি বলেছেন–'উমারাণী', 'উপেক্ষিতা', 'জাল', 'আহ্বান', 'বামা', 'কিন্নর দল','মৌরিফুল', 'চৌধুরাণী', 'অসাধারণ' প্রভৃতি গল্পে। নারীর সহৃদয় ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপণ এই গল্পগুলিকে নবতর মাত্রায় উদ্ভাসিত করেছে। 'উমারাণী' ও 'উপেক্ষিতা' গল্প দুটি ভাই-বোনের মধ্যকার নিষ্কলুষ ভালোবাসা-প্রীতির প্রতীকসম হয়ে উঠেছে। উমা কথকের নিজের বোন নয়, কথকের বোন মারা যাওয়ায় এবং উমার নিজের দাদা না থাকায় উভয়ের বুভুক্ষু হৃদয়ের সাধ পূর্ণতা পেয়েছে। উমা সর্বদা দাদার চিন্তায় অস্থির, দাদাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে তাকে সুখী দেখার আকাঙ্ক্ষা এ গল্পে অনুরণিত হয়েছে। উমা দাদার জন্য পশমের জুতা তৈরি করে, তার হবু বৌয়ের জন্য নিজের মিষ্টান্ন খাবার লোভ জলাঞ্জলি দিয়ে সেই টাকায় রূপার কাঁটা গড়ায়। যে টাকা সে নারকেলের পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাঠি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে তিলে তিলে উপার্জন করেছিল। 'উপেক্ষিতা'ও কথকের পাতানো-বোন বৌদির সহৃদয় প্রীতির বর্ণাঢ্য গল্প। বৌদির কথকের ওপর এত টান থাকার কারণ তার ভাই বিমল যে অকালে মারা গিয়েছিল তার চেহারার সঙ্গে কথকের চেহারার সাদৃশ্য। তাই সমাজ ও বাড়ির লোককে লুকিয়ে বৌদি প্রায় প্রতিদিনই নানা খাবার (ক্ষীরের পুতুল, কলার বড়া, গোকুল পিঠে, দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি, মোহনভোগ প্রভৃতি) কথককে দিত। কথকের জামার বোতাম ছিল না, পরম মমতায় তার জামার বোতাম লাগিয়ে দেয় সে। ভাই-ফোঁটার দিনে দশ টাকা দিয়ে ভাইকে আশীর্বাদ করে। পাতানো ভাইয়ের সাথে প্রীতির সম্পর্ক বাঙালি নারীর সহৃদয়তারই প্রমাণ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নারীকে মায়ের জাতি হিসেবেই বিবেচনা করেছেন আজীবন। স্নেহময়ী মাতৃরূপা নারী বিভূতিভূষণের প্রিয়, এই মাতৃস্বরূপার ভালোবাসা, বাৎসল্যের আতিশয্যের গল্প 'আহ্বান' ও 'জাল'। 'আহ্বান' গল্পের মুসলমান বৃদ্ধার কথকের প্রতি অনিঃশেষ ভালোবাসা সকল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে মাতৃহৃদয়ের ভালোবাসার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। বৃদ্ধার গায়ে-পড়া স্বভাবজাত স্নেহ লেখককে বিরক্ত করলেও বুড়ির মৃত্যুর পর কথক সে ভালোবাসা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছে। লেখকের মনে পড়ে–

> আমার মনে পড়লো বুড়ি বলেছিল সেই একদিন–আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা। এর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কি ভাবে আহ্বান করে এনেচে। আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার তাচ্ছিল্য করতে পারেনি। [...] শুকুর মিঞা বল্লে– দ্যাও বাবাঠাকুর, তুমিও দ্যাও–তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠাণ্ডা হবে–
>
> দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো–অ মোর গোপাল।[২২]

'জাল' গল্পের অনসূয়া বাঈ ভরহেচ্ নগরে আশ্রিত কথক হিতেন্দ্রনাথ কুশারীকে নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসেন, কোনোদিন তার খাবার-দাবারের ত্রুটি হতে দেননি। পাণ্ডববর্জিত ভরহেচ্ নগরে কথকের নাগরিক মন হাঁপিয়ে উঠেছিল, তাই অনসূয়া বাঈয়ের সাথে সে রাঁচি যায় এবং পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু অনসূয়া বাঈ মনে করে, কথক গাঁয়ের লোক হয়তো শহরে এসে হারিয়ে গেছে। 'মা যেমন হারানো সন্তানকে খোঁজে, তেমনি করে অনসূয়া বাঈ খুঁজলে তাদের অর্থবল ও লোকবল দিয়ে আমাকে। খুঁজে বার করলে রাঁচি-চক্রধরপুর-সার্ভিসের বাস্ থেকে।'[২৩] কথক স্বীকার করে, 'না; ওদের মন কি সুন্দর! কত জায়গায় গেলাম, ওদের মত মন কোথাও পেলাম না।'[২৪] 'বামা' গল্পে বামার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির সবাই ফাঁসুড়ে ডাকাত। তারা দিনের বেলা মানুষকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়, রাতের বেলা ঘুমন্ত অতিথির সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে ফেলে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে নিজের জীবন বাজি রেখে ফাঁসুড়ে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়ে বামা সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছে। 'চৌধুরাণী' গল্পে বিধবা আশালতা সৎ-মায়ের সন্তানদের নিজের ভাইয়ের মতো আগলে রাখে। বৈমাত্রেয় ভাই শরৎ-এর সম্পত্তি দখলের ষড়যন্ত্র রুখে দেয়, শরৎ তার নামে কুৎসা রটালেও শরৎ-এর স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্ব-প্রণোদিত হয়ে আশালতা তার সন্তানদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব নেয়। গ্রামের বৃদ্ধ বেণী হালদারের কেউ ছিল না, তাই আশালতা তার রান্নার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল। পরোপকারী মনোভাবের জন্য গ্রামের সকলেই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। এ সম্পর্কে গল্পকারের উক্তি :

> অনেকে অনেক রকম সাহায্য পেতো আশার কাছ থেকে। কারো আঁতুড়ে রাত জাগতে হলে আশা, কোন যজ্ঞি-বাড়ীতে রান্না করতে আশা, কারো বাড়ী থেকে পুরুষ অভিভাবক বিদেশ যাবেন, সে বাড়ীতে দু-চার দিন শুতে হলে আশা, কারো বাড়ীর ডাল বেটে দেবার সময়ে আশা। সারা গাঁ-খানার যে কোনো বিপদে আশাকে সবাই স্মরণ করবে এবং পাবেও। পাবে ঠিকই, ঘড়ির কাঁটার মত পাবে। কখনো নিরাশ করেনি কাউকে।[২৫]

আশালতার মতো পরোপকারী, হৃদয়বান, নিঃস্বার্থ চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'অসাধারণ' জাতিতে হাড়ি ম্যালেরিয়াশীর্ণ, গনোরিয়াগ্রস্ত, খোঁড়া অকর্মণ্য বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অসামান্য ভালোবাসার গল্প। আপার প্রাইমারি স্কুল পাস করা হাড়ি বৌটি ধান ভানার কাজ করে, ধাইয়ের কাজ করে, দুর্ভিক্ষের দিনেও নিজে না খেয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ হাড্ডিসার স্বামীকে সুস্থ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এই দরদ শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রীর দায় থেকেই উৎসারিত নয়, মানবিকতাবোধের ও ভালোবাসার উজ্জ্বল নিদর্শনও বটে। 'কিন্নর দল' গল্পে শ্রীপতির বৌয়ের আগমনের পূর্বে গ্রামে মজুমদার বাড়ির ভাঙা রোয়াকে প্রতিদিন দুপুরে পাড়ার মেয়েদের মেয়ে-গজালি হতো। গ্রামের গরিব, অশিক্ষিত মহিলা বলেই এরা ছিল হিংসুক। একে অপরের বদনাম ও মুখরোচক পরনিন্দা করেই হৃষ্ট চিত্তে দিনগুজরান করতো। শ্রীপতির বৌ এসবে অভ্যস্ত ছিল না, তার আপন-পর জ্ঞান ছিল না, সে সবার সঙ্গেই খুব ভালো ব্যবহার করতো, সবাইকে মূল্যায়ন করত। গল্পকারের ভাষ্য মতে :

> […] শ্রীপতির বৌ সম্পূর্ণ দিলদরিয়া মেজাজের মেয়ে। দেবার বেলায় সে কখনও না বলে কাউকে ফেরায় না, যদি জিনিসটা তার কাছে থাকে। একেবারে মুক্তহস্ত সে বিষয়ে–কিন্তু আদায় করতে জানে না, তাগাদা করতে জানে না, মুখে তার রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হাসিমুখ ছাড়া তার কেউ কখনও দেখেনি।[২৬]

শ্রীপতির বৌ শিক্ষিত, মার্জিত, সুন্দরী ও শিল্পিত মানসিকতার হওয়ায় তার ব্যক্তিত্বের সোনার কাঠির স্পর্শে এসে গ্রামের নারীকুলের চেতনাগত ও আচরণগত পরিবর্তন আসে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নারীর হৃদয়ের অতলে যে স্নেহময়ী, উদার ও মমত্ববোধে পরিপূর্ণ উষ্ণ স্রোত আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর ছোটগল্পে এর সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি একচোখা নন, নারীর উদারতার পাশাপাশি নিষ্ঠুরতার দিকটিও তাঁর গোচরে ছিল। 'মুক্তি' গল্পে ছেলের বৌ, শাশুড়ির হৃদয়হীনতায় মুমূর্ষু নিস্তারিনীর অন্নাভাবে মৃত্যু নারীর নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক। পাণ্ডুর রোগে আক্রান্ত নিস্তারিনী ভাত চাইলে তার শাশুড়ি বলে– '[…] জ্বর রয়েচে চব্বিশ প্রহরের জন্যি। ভাত খেলেই হল অমনি?...বলি, সোয়ামী খেয়েচ, পুত্তুর খেয়েচ, দেওর খেয়েচ–এখনো খাওয়ার সাধ মেটেনি তোমার?'[২৭] 'প্রত্যাবর্তন' গল্পের বিনোদের প্রতি কাকিমার আচরণ, 'পাঁচুমামার বিয়ে' গল্পে আশ্রয় ও সহায় সম্বলহীন, অভিভাবকহীন নিরীহ পাঁচুমামার স্ত্রীকে বিনাদোষে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, 'ঝগড়া' গল্পে ম্যালেরিয়াশীর্ণ অসুস্থ বৃদ্ধ কেশব গাঙ্গুলীর প্রতি তার স্ত্রী মুক্তকেশী ও কন্যাদ্বয়ের পৈশাচিক আচরণ, 'মৌরীফুল' গল্পে স্নেহ-বুভুক্ষু সুশীলার শাশুড়ি কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে অকাল মৃত্যু, 'পুঁইমাচা' গল্পে ক্ষেন্তির প্রতি তার শাশুড়ির অমানুষিক নির্যাতন নারীর নিষ্ঠুরতার স্বাক্ষর বহন করে। কিশোরী ক্ষেন্তি ও *পথের পাঁচালী* উপন্যাসের কিশোরী দুর্গা চরিত্রের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। দুর্গার মৃত্যু হয় নিজের বাড়িতে এবং ক্ষেন্তির মৃত্যু হয় বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে। মৃত্যুজনিত এ পার্থক্য ছাড়া তাদের দুজনেরই প্রকৃতিপ্রীতি ও সাধারণ অন্যান্য আচরণের মধ্যে প্রচুর মিল পাওয়া যায়। এছাড়া ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণা ও বাবা সহায়হরি'র সঙ্গে অপুর মা সর্বজয়া ও বাবা হরিহরের চরিত্রের মূলগত সাদৃশ্য পাওয়া দুষ্কর নয়। 'বাটি চচ্চড়ি' গল্পে মুখরা রমণী বিধবা পিসিমার দ্বারা তার ভাতৃবধূ মৃত্যুপথযাত্রী অলকার প্রতি অমানবিক আচরণ নারী হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচায়ক।

৩.৪

'বুধোর মায়ের গল্প', 'হিঙের কচুরি', 'গিরিবালা', 'বিপদ' এসব গল্পে সমাজের চোখে নীচ ও হীন কাজ পতিতাবৃত্তিকে গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছেন স্বাভাবিক সারল্যে। বুধোর মা, গিরিবালা, কুসুম, হাজু সমাজের কাছে অস্পৃশ্য, পাপিষ্ঠা হলেও গল্পকার তাদের এই পাপকে প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন করেছেন কারণ মানুষকে তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পর্যবেক্ষণ করেছেন। 'বিপদ' গল্পের হাজু যখন গ্রামে ছিল তখন চুরি ও ভিক্ষাবৃত্তি করেও পেটভরে খেতে পারেনি। শহরে নিষিদ্ধ পল্লীতে নাম লেখাবার যে পাপ তা তাকে স্পর্শ করে না। জীবনে ভালো থাকার অধিকার সবারই আছে। বহুদিন পরে গ্রামের অভিভাবককে পেয়ে অতি উৎসাহের সঙ্গে সে তার নিজের টাকায় কেনা আয়না, একটি টুকনি ঘটি, একটা সুদৃশ্য কৌটা দেখাতে

থাকে। তার উৎসাহ, আনন্দ দেখে তাকে সঠিক পথে ফেরাবার উপদেশ দেওয়া হয়ে ওঠে না কথকের বরং মনে হয় :

> যে কখনো ভোগ করে নাই, তাহাকে ত্যাগ করো যে বলে, সে পরমহৈতিষী সাধু হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞানী নয়। কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ ও পথে আসিয়া ওর অন্নবস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়া প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা-পিরিচে–যার বাবাও কোনোদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাহাকে তুচ্ছ করিয়া, নিন্দা করিবার ভাষা আমার জোগাইল না।[২৮]

বুধোর মা শেষ জীবনে কাশীতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এই সৌভাগ্যের মৃত্যুকে সমাজের মানুষ ভালো চোখে দেখতে পারে না। গিরিবালা প্রথম জীবনে দুশ্চরিত্রা থাকলেও শেষজীবনে গিয়ে ধর্মের সেবক হয়, আশ্রম খোলে। গ্রামের সাধারণ মানুষ যৌবনের বারাঙ্গনা গিরিবালাকে চেনে, ধর্মপ্রাণ গিরিবালার প্রতি তাদের আগ্রহ নেই। মানুষের জীবনের স্বাভাবিক বিবর্তনের প্রতি খেয়াল করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়। বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে শোধরাতে পারে বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা। গিরিবালা'র বিবর্তনও সে সূত্রেই হয়েছে। বুধোর মা, গিরিবালা, কুসুম, সুলোচনা, হাজু এদের কারো সাথেই কথকের পতিতা-খদ্দেরের সম্পর্ক ছিল না। ফলে তিনি তাদের স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে শিশুর সারল্য ও মানবিকতার মানদণ্ডে বিবেচনা করেছিলেন। গল্পকার অস্পৃশ্য পতিতা হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেই তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৩.৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রতি আগ্রহী হওয়ার প্রধান কারণই হলো তারা প্রকৃতির মতোই সহজ-সরল ও অনাবিল। সততা ও নিঃস্বার্থ আচরণ এদের চরিত্রের ভূষণ। মজ্জাগত চরিত্রে স্বাভাবিক সারল্যের সহজপ্রাপ্যতাই তাঁকে এদের নিয়ে অনেকগুলি ছোটগল্প রচনা করতে উজ্জীবিত করেছে। তিনি তাঁর *বনে পাহাড়ে* দিনলিপিতে আদিবাসীদের সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন :

> [...] এরা সারাদিন জঙ্গলে কাজ করে, বাঘ-ভালুকের মুখে। সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে দুটি নিরুপকরণ তণ্ডুলসিদ্ধ খেয়ে মহানন্দে দিন কাটায়। এতেই ওদের খুশি উপচে পড়ছে। আমরা ওদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম। কি সুন্দর জীবন এদের তাই ভাবি। এই যে বাইরের সভ্য জগতে এত যুদ্ধ, খাদ্যাভাব, লোকের দুঃখকষ্ট–তার কোনো আঁচ এসে এখানে পৌঁছায়নি। কেরোসিন তেল পাওয়া না গেলেই বা এদের কি, চিনির দামচালের দাম চড়লেই বা এদের কি! এরা ওসব কোনো জিনিসের ধার ধারে না। বনে বাস করে, বন-প্রকৃতিই এদের সমস্ত জিনিস জোগায়।[২৯]

আদিবাসীদের প্রসঙ্গ 'শিকারী', 'চাউল', 'কয়লা-ভাঁটা', 'কালচিতি', 'বোতাম', 'কবি' প্রভৃতি ছোটগল্পে উঠে এসেছে। 'শিকারী' গল্পে বাসুড়ি সাঁওতালের ম্যালেরিয়াশীর্ণ ছেলে মাগনিরামের বাবার মান-সম্মান বৃদ্ধির বাসনা ও নগদ একশত টাকা পুরস্কারের আশায় নিজের জীবনের বিনিময়ে বন্যহস্তী শিকারের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে। 'চাউল' দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত একমুঠো অন্নের জন্য হপ্তায় মাত্র পাঁচ সের চালের জন্য কোম্পানিতে কাজ নেওয়া থুপীর বাবার অকাল জীবনাবসানের মর্মান্তিক গল্প। প্রকৃতির কোলে

বসবাসরত আদিবাসী কয়লা শ্রমিকদের নিজেদের মজুরির মূল্য সম্পর্কে অসচেতনতা ও সরল জীবনযাপনের গল্প 'কয়লাভাটা'। 'কালচিতি' যেন অরণ্য ও মানুষের যুগপৎ গল্প। 'বোতাম' গল্পে আদিবাসী হো তরুণী চম্পূর খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর রাজনৈতিক নেত্রী এলিশাবা কুই'য়ে রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনি বিবৃত হয়েছে। 'কবি' গল্পে কবি রঘুনাথ দাস-এর জীবনযাত্রা ও সাহিত্যচর্চা যেন প্রকৃতির সমানুপাতে মানব সত্তার প্রকৃতিমগ্নতার সরল আখ্যান। *বনে পাহাড়ে* ও *হে অরণ্য কথা কও* (১৯৪৮) দিনলিপি দুটিতে আদিবাসী প্রীতির পরিচয় আছে। এছাড়া *আরণ্যক* (১৯৩৯) উপন্যাস তো অরণ্যবাসী অভিবাসী মানুষেরই ইতিবৃত্ত।

৩.৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষের সততা অনুপ্রাণিত করতো, মানুষের শঠতাও কিছু কম পোড়াতো না। মানুষের সততার গল্প হলো: 'দৈবাৎ', 'পড়ে পাওয়া', 'হাজারি খুড়ির টাকা', 'বে-নিয়ম', 'শান্তিরাম', 'রূপো বাঙাল' প্রভৃতি। 'দৈবাৎ' ও 'পড়ে পাওয়া' মোটা অংকের টাকা কুড়িয়ে পাওয়ার পর সেই টাকা আত্মসাৎ না করে মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সৎ মানসিকতার গল্প। 'বে-নিয়ম' ও 'রূপো বাঙাল' গল্পে কর্মচারীর বিশ্বস্ততার গল্প বিধৃত হয়েছে। 'হাজারি খুড়ির টাকা' গল্পে হাজারি খুড়ি ও তার ছেলে বলাই বজ্রপাতে মারা যাওয়ার পর তার অনাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও চারশো টাকার জায়গায় সাত-আটশো টাকায় তাদের শ্রাদ্ধ করার মানসিকতা সতীশ ঘোষের অপরিসীম সততা ও উদারতার পরিচায়ক। 'যাত্রাবদল', 'একটি দিনের কথা', 'বড়বাবুর বাহাদুরি' গল্পে একই সমান্তরালে দুটি বিরুদ্ধ স্রোত সততা ও শঠতার প্রতিচিত্রণ লক্ষণীয়। উপর্যুক্ত গল্পে মানুষের ভেতরের হীনতা, দৈন্য ও নীচ স্বার্থপরতা এবং সহৃদয় মনুষ্যত্বের সহাবস্থান দেখানো হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্জিত জীবনবোধ মানবজীবনের অন্তর্গত এই ধনাত্মকতা ও ঋণাত্মকতা দুটিকেই স্বীকার করেছে এবং তিনি দোষ-গুণ সংবলিত সমগ্র মানবসত্তাকেই গ্রহণ করেছেন। মানুষ যেখানে চরম মাত্রায় লোলুপতার পরিচয় দিয়ে মনুষ্যত্বের অপমান করে সেখানে তিনি তীব্র নিন্দা ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। 'ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর', 'অভয়ের অনিদ্রা', 'কমপিটিশন' প্রভৃতি গল্পে মানুষের মানবতা বিবর্জিত স্থূল লোভের প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন। 'উড়ুম্বুর', 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' গল্পে অর্থ ও যশলোভী আধুনিক লেখক ও সিনেমার প্রতি পরোক্ষ নিন্দাবাদ ও মৃদু কটাক্ষ লক্ষ করা যায়।

৩.৭

ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের কারণে বিদেশীদের প্রতি দেশীয় লেখকদের সহমর্মিতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। ঔপনিবেশিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাদের সাধারণত অত্যাচারী ও মতলববাজ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। 'থনটন কাকা' ও 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব' গল্পে বিদেশিদের প্রতি গল্পকারের সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। কারণ থনটন কাকা ও ফালমন সাহেব অন্য ইংরেজদের মতো নয়। ফালমন সাহেব শরীরে ইংরেজ বংশধর হলেও মননে পুরোপুরি বাঙালি ছিলেন। গল্পটির বাস্তব ভিত্তি আছে। *হে অরণ্য কথা কও* দিনলিপিতে গল্পকার বলেছেন– 'সাহেবদের

নীলকুঠির ধ্বংসস্তুপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম–কোথায় আজ সেই লালমুরা ফালমন সাহেবের দল, কোথায় তাদের বলদর্পিতা, গর্বিতা, মেমের দল [...]'[৩০] এছাড়া ফালমন সাহেব ও নীচজাতীয় দাসীর সঙ্গে *ইছামতী* (১৯৫০) উপন্যাসের বড় সাহেব ও নীচকুলোদ্ভব গয়ামেমের সাদৃশ্য আছে।

৩.৮

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ছিলেন সাহিত্য-শিল্পী ও শিক্ষক। ফলে শিক্ষক ও শিল্পীদের প্রতি দুর্বলতাবশতই হয়তো তাদের কেন্দ্র করে অনেক ছোটগল্প রচনা করেছেন। 'ঝড়ের রাতে', 'আর্টিস্ট', 'কবি কুণ্ডু মশায়', 'রামতারণ চাটুজ্জে–অথর', 'বন্দী', 'জনসভা', 'বারিক অপেরা পার্টি' গল্পের শিল্পী অথবা শিক্ষক সবাই সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন, শিল্পচর্চা বা সাহিত্য সেবা এদের কারোই পেশা ছিল না, ছিল নেশা। *পথের পাঁচালীর* (১৯২৯) দ্বিতীয় অংশ *অপরাজিত* (১৯৩২)-র আজবলাল ঝা, সে কবি ও শিক্ষক। তার টোল চলে না, তার কাব্য কেউ পড়ে না। কারণ বিভূতিভূষণের অন্য সাহিত্যসেবী চরিত্রের মতই সেও বর্তমান সাহিত্য সম্পর্কে কিছুই জানে না, একেবারে প্রাচীন সাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষায় মগ্ন হয়ে থাকে। আজবলাল ঝার মতো আরেকটি চরিত্র *পথের পাঁচালী*-র অপুর বাবা। শিক্ষক আজবলাল ঝার সাথে *আরণ্যক*-এর শিক্ষক মটুকনাথের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'আরণ্যকের নৃত্যশিল্পী ধাতুরিয়া, কবি বেঙ্কটেশ্বর ও বৃক্ষপ্রেমিক যুগলপ্রসাদ এ জাতীয় চরিত্র।'[৩১] গল্পকার এদের তাচ্ছিল্য বা করুণা প্রদর্শন করেননি। তাঁর ছোটগল্পগুলোতে জীবনযুদ্ধে অসফল শিল্পীদের প্রতি মমত্ববোধেরই প্রকাশ ঘটেছে।

৩.৯

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীমন চিরকালই শিশু। 'নব-বৃন্দাবন', 'সীতারামের বাড়ি ফেরা' ও 'খেলা' ছোটগল্পে সন্তানের প্রতি পিতার বাৎসল্যের চিত্র অংকিত হয়েছে। *ইছামতী* (১৯৫০) উপন্যাসের ভবানী চরিত্রেও সন্তানের জন্য অপরিমেয় স্নেহের প্রতিফলন দেখা যায়। 'ঠেলাগাড়ি' গল্পের খোকার সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পুন্নাম' গল্পের টুনু চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। 'পুরোনো কথা' অসুস্থ মায়ের স্নেহবঞ্চিত শিশুহৃদয়ের আকুতির গল্প, 'তালনবমী' গল্পে নিম্নবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির শিশুর তালনবমীর নিমন্ত্রণ না পাওয়ার বেদনা শিল্পিত হয়েছে।

স্মৃতিই পরিণত মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। স্মৃতিভুক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অতীত থেকে আনন্দ-বেদনার স্বাদ আহরণ করার জন্য পূর্ব-প্রণয়ের গল্প লিখেছেন। 'পারমিট', 'বিড়ম্বনা', 'বাঁশি', 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' নামক গল্পে পূর্ব-প্রণয়ের অম্ল-মধুর স্বাদের গল্প পরিবেশিত হয়েছে। 'পারমিট' গল্পে আকালের সময় সস্তায় দু'মণ ধানের জন্য হাকিমের কাছে কথকের আবেদন মঞ্জুর করায় হাকিমের স্ত্রী বিনু। যাকে অনেকদিন আগে বিয়ে করতে অসম্মতি জানিয়েছিল কথক। এ গল্পের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। একই গোত্রভুক্ত গল্প 'বিড়ম্বনা'। মৃত স্বামী বনোজের প্রিয় বাঁশি নিয়ে সুলেখার স্মৃতি রোমন্থনের গল্প 'বাঁশি'। 'বাঁশি'

গল্পের সাথে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসী মামী' গল্পের দূরাগত সাদৃশ্য বর্তমান। 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' হীরু ও কুমীর সুপ্ত ব্যর্থ প্রেমের আলেখ্য। অনেকদিন পর কুমীর ঘরে অরন্ধনের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে হীরুর হৃদয়ের গোপন ব্যথা প্রকটিত হয় যখন সে বুঝতে পারে– '[...] আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা বলে অমন আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গে তো রোজ কথা হয়...কই...'[৩২] বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নানা শ্রেণি, পেশা, ধর্মের মানুষের সাথে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন, সেসব মানুষের অন্তর্লোকের বাস্তবতাকে সাহিত্যে প্রতিফলনও ঘটিয়েছেন। তিনি *অভিযাত্রিক* দিনলিপিতে এ সম্পর্কে বলেন:

> দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেড়িয়েচি? [...] মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরু অভিযানের মতই কষ্ট ও অধ্যবসায়সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।'[৩৩]

সমাজে ব্যক্তির অসংগতির চিত্র চসার-এর *ক্যান্টারবেরি টেলস*-এর অনুসরণে 'অনুশাসন' গল্পটি রচিত। বালাদাস পুরকায়স্থ সেন্ট জেভিয়ার মন্দিরের সহকারী পুরোহিত। তিনি রবিবার সকালে সর্ব-সাধারণের পাপস্বীকার গ্রহণ করেন ও বিধি অনুসারে দণ্ড দেন। একজন চাষা পাপ স্বীকার করে এবং বলে সে মঙ্গলদাসের শালী সখীবাই পানজিমের নাম করা সুন্দরী ও নাচনেওয়ালীর গোসলের দৃশ্য গোপনে দেখে ফেলেছে। পাপের দণ্ডদানের পর পরদিন সেই চাষা ও পুরোহিতের সাক্ষাৎ ঘটে একই পাপকর্মের সমান্তরালে দাঁড়িয়ে। লঘু কৌতুকরসের গল্প হলেও গল্পকার সমাজের অসংগতির চিত্র চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। 'আমার ছাত্র' গল্পে কথকের গণেশদাদা গ্রামের অশিক্ষিত দিনমজুর। বৃদ্ধ বয়সেও তার পড়াশুনা করবার আশ্চর্য আগ্রহই গল্পের সারবস্তু। এ গল্পের সাথে বনফুলের 'অর্জুন কাকা' গল্পের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তবে এদের মূল পার্থক্য গল্পকারদের দৃষ্টিভঙ্গিজাত। দরিদ্রতার কারণে পিতা-মাতার কোলের সন্তান হারানোর হৃদয় বিদারক গল্প 'অন্নপ্রাশন'। 'ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল' গল্পটিতে নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত একত্রবাস নীতিবান পাঠকের কাছে সমাজনীতির হানিকারক মনে হতে পারে। কিন্তু গল্পকারের সহৃদয় সহানুভূতিতে বৃদ্ধ ক্যানভাসার কৃষ্ণলালের জীবনের অকৃতার্থতাও মোহনীয় রূপ লাভ করেছে। 'তিরোলের বালা' গল্পটি বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অসাধারণ ও অভূতপূর্ব সৃষ্টিকর্ম। গল্পটি একজন অনিন্দ্যসুন্দরী 'সিজোফ্রেনিয়া' রোগী পূর্ণিমার, যে রোগগ্রস্ত অবস্থায় কী কী করে কিছুই মনে রাখতে পারে না। তার ভাই তাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার সময় পথিমধ্যে রাত হওয়ায় এক কৈবর্তের ঘরে আশ্রয় নেয়। সকালবেলা উঠে দেখা যায়, ঘরের মধ্যেই রোগীর ভাইয়ের গলা কাটা। রোশিণী রোগের ঘোরে মাছ কাটা বটি দিয়ে নিজের হাতে ভাইয়ের গলা কেটে ফেলেছে অথচ সকালে উঠে ব্যাপারটা সে বুঝতেই পারে না। অতি নাটকীয় সমাপ্তি পাঠকের মনে ঘা দেয়, এক ধরনের ভয়ানক রসের সৃষ্টি করে। গল্পকারের নির্মোহ বর্ণনার গুণে গল্পটি অনবদ্য সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিতান্ত সাধারণ আকাঙ্ক্ষার খোঁজও রাখতেন গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩.১০

মানব জীবনের আলোকোজ্জ্বল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপের নির্মোহ যৌথ প্রকাশই তাঁর মানববীক্ষার পটুত্বের পরিচায়ক। বিচিত্র মানুষের সাহচর্য, মানুষের জটিল জীবনাভিজ্ঞতা ও লালিত স্বপ্নের বৈপরীত্য এবং মানবপ্রেম হতে উৎসারিত মানবসত্তার চিন্তনসূত্রের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রকৃতি-চেতনার সম্মিলন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ছোটগল্পে অসংখ্য বৈচিত্র্যময় মানবচরিত্র সৃষ্টিতে প্রণোদিত করেছে।

৪. মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর-এর অন্বয়সূত্র

পৃথিবীর সকল ধর্মের বিবেচনায় মানুষ ও প্রকৃতি স্রষ্টা তথা ঈশ্বরের সৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্বের আলোকে জন্মসূত্রে এরা পরস্পর অন্বিত। নিম্নে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে এই ত্রিতত্ত্বের সম্মিলনের গতি-প্রকৃতি আলোচনার চেষ্টা করা হলো :

গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষ ও প্রকৃতিকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখিয়েছেন 'কালচিতি' ও 'কবি' গল্পে। তথাকথিত যান্ত্রিক সভ্যতার আলো থেকে কিছুটা দূরে প্রকৃতির আশ্রয়ে আদিবাসী মানুষের সাবলীল জীবনযাত্রার ইতিবৃত্ত হলো 'কালচিতি'। গল্প পাঠান্তে এক ধরনের ভালোলাগার আবেশ সৃষ্টি হয় যা প্রাক-বৃটিশ আমলের ভারতবর্ষের আবহ তৈরি করে। প্রকৃতির কোলেই বাঘ, বন্য-হস্তি ও ভাল্লুকের সাথে এ আদিবাসীদের নৈমিত্তিক বসবাস। এ বনাঞ্চলের অরণ্যচারী মানুষ সম্পর্কে গল্পকারের ভাষ্য:

> [...] এ সব বন্য দেশে আটা ছাতু প্রভৃতি খাদ্য একেবারে অচল। এরা ভাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। এমন কি তরকারি পর্যন্ত খায় না, হয়তো একটু শাকভাজা আর নুনের টাকনা দিয়ে এক বড় জামবাটি ভর্তি পান্তাভাত দিব্যি মেরে দিলে। তাতেই এদের সবল স্বাস্থ্যবান পাথরেকোঁদা চেহারা, ধনুকবাণ নিয়ে বড় বাঘ ও বুনো হাতী আর ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের সামনে এগিয়ে যাবে নির্ভয়ে। আর ভালুক? সে তো এদের ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়। সন্ধ্যের অন্ধকারে বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘোরে।[৩৪]

আদিবাসীরা বাজারের বিড়ি কিনে খায় না, খায় পিকা অর্থাৎ কাঁচা শাল পাতায় জড়ানো তামাকের পাতা। পাহাড়ি ঝরনা থেকে খাবারের পানি আসে। অতিথি আপ্যায়নেও তারা নিজেদের উৎপাদিত শস্য ব্যবহার করে। কথকের ভাষ্যমতে–'ঘটিতে চা এল, আর এল তালের পরোটা, গরম ভাজা মুড়ি, তালের ক্ষীর, মর্তমান কলা আর শসার কুচি নুন-নেবু মাখানো। যা কিছু সবই গ্রামের, কেবল পরোটার আটা এসেছে বাইরে থেকে। অবশ্যি চা-চিনিও। খাঁটি দুধের তৈরি তালের ক্ষীরটি অতি উপাদেয় হয়েছিল।'[৩৫] কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় গ্রামের কুটিরে কুটিরে মাটির প্রদীপে মহুয়া বীজের তেল ও বন-করনজার তেলের আলো জ্বলে। বিদায় দেবার সময় গ্রামপ্রধান নারান হাঁসদা উপঢৌকনস্বরূপ কথকের গরুর গাড়িতে ঢেঁড়স, কুমড়ো, পাতিলেবু, বড় একছড়া মর্তমান কলা ও একহালি তাল তুলে দিয়েছিল। প্রকৃতি এসব অরণ্যচারী সরল মানুষগুলোকে সন্তানের মতোই আগলে রাখে। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে আজন্মলালিত আদিবাসী মানুষরা প্রকৃতির মাঝে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই আত্মতুষ্টি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। 'কবি' গল্পে গল্পকার প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন কবি রঘুনাথ দাসের সরল জীবনচর্যার প্রামাণ্য চিত্র অঙ্কনের

পটভূমিতে। প্রকৃতি ও রঘুনাথ দাসের আন্তঃসম্পর্কের নিবিড়তা, সজীব কবিপ্রাণে অপরিহার্য প্রকৃতির মূর্ছনা, মানুষ ও প্রকৃতির সহাবস্থানের ঔপনিষদিক আনন্দের উদ্বেলতাকে নির্দেশ করে।

মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বর তিনটি বিষয়ের সার্থক সমন্বয় ঘটেছে 'জাল', 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে। 'জাল' গল্পে বৃদ্ধ রামলাল তুলসীদাসের রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডক বনের শোভা ও সৌন্দর্যে আপ্লুত হয়ে রাঁচির অদূরে দেড়শো বিঘা সম্পত্তি কিনে নিবিড় অরণ্যের মাঝে ভরহেচ্ নগর পত্তন করেন। মৃত্যুর সময় যখন বলেন–'ওসব বাত ছোড়ো। আমার বড় চৈন সে দিন বীত গিয়া এই বনের মধ্যে! তুলসীজী বলিয়েছেন–শোভিত দণ্ডক কি রুচি বনী–।'[৩৬] এই উক্তি থেকেই তার ঈশ্বর ভক্তির নমুনা সংগ্রহ করা যায়। ভরহেচ্ নগরের প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে মুগ্ধ কথকের ভাষ্যে :

> [...] কি অপূর্ব শোভা চারিদিকে। কম্‌ব্রিটাস-লতার সাদা পাতার গুচ্ছ বড় বড় শালগাছের মাথায় এমনভাবে সাজানো, যেন দূর থেকে মনে হয় ওরা শালতরুর পুষ্পস্তবক। পাহাড়ের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, নিঃশব্দে বনভূমিতে দূরে-দূরে রহস্যময় অন্ধকার নেমেছে। বনের মধ্যে ধনেশ পাখী কু-স্বরে ডাকছে, বড় সম্বর হরিণের রব শোনা গেল একবার মাত্র। কি নির্জন চারিধার...মুক্তরূপা ধরিত্রীর জ্যোৎস্না, সূর্যাস্ত ও অরুণোদয় এখানে এক-একটি কাব্য। শুধুই সবুজ বনশীর্ষ, শুধুই ধূসরবর্ণ পাথরের তৈরী শিখরদেশ, অস্ত-দিগন্তের সিঁদুর ছোঁয়া... ।[৩৭]

বৃদ্ধ রামলাল ও তার পুত্রবধূ অনসূয়া বাঈয়ের বাঙালি অতিথি হিতেন্দ্রনাথ কুশারীর প্রতি সন্তানবৎ বাৎসল্যের পরিচয় পূর্বোক্ত 'মানুষ' অংশে আলোচনায় উঠে এসেছে।

'কুশল পাহাড়ী' গল্পে সহজ-সরল প্রকৃতির সন্তান আদিবাসী মঙ্গল টুডু আছে। মঙ্গল টুডুরা চুরি করতে জানে না। তাদের জীবনে চাহিদা খুবই কম। তারা অল্পে সন্তুষ্ট, তাই খাটতে চায় না। টাকার মূল্য তারা বোঝে না। সাধুর ভৈরব থানে গিয়ে কথকের মনে হয় 'সব যেন এখানে সুপ্রাচীন–প্রাচীন সাধু, প্রাচীন শালবৃক্ষ, প্রাচীন শিলাসন, প্রাচীন অরণ্যভূমি।'[৩৮] কথক ভৈরব থানের সাধুজীর মুখে ঈশোপনিষদের "কবির্মনীষী পরিভূঃসয়ম্ভু" শ্লোক শুনে মুগ্ধ হয়ে ব্যাখ্যা শুনতে থাকেন :

> কবিই তিনি বটেন বাবা। এখানে বসে বসে দেখি। এই শালগাছটাতে ফুল ফোটে, বর্ষাকালে পাহাড়ে ময়ূর ডাকে, ঝর্না দিয়ে জল বয়ে যায়, তখন ভাবি, কবিই বটে তিনি। আমি কিছু পাইনি বাবা। ভড়ং দেখচো-এসব বাইরের। ভেতরের জ্ঞান কিছু হয়নি। তবে দেখতে চেয়েচি তাকে। তাঁর এই কবিরূপ দেখে ধন্য হয়েছি।[৩৯]

প্রকৃতির মাঝেই ভৈরব থানের সাধু কবিরূপে ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছেন। মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে 'কুশল পাহাড়ী' গল্পে। প্রকৃতির মাঝেই সর্বদা বিরাজমান স্বয়ং ঈশ্বর। ঋগ্বেদে পরাক্রমশালী ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতিকে একে অন্যের পরিপূরক বা আধাররূপে তৈরি করেছেন। বেদ-এ উল্লেখিত ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি ত্রিতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে সমালোচকের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য :

> [...] মৃত্যুর পরও দেহ ও প্রাণ এই মহাপ্রকৃতিতে আশ্রয় নেয়। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ–এই পাঁচটি মহাভূত থেকে আমাদের প্রত্যেকের ব্যষ্টি দেহ নির্মিত হয়েছে অর্থাৎ

> আমাদের ব্যষ্টি দেহরূপ কার্যের সাক্ষাৎ কারণ এই পাঁচটি মহাভূত। আমাদের মৃত্যু হলেও দেহের আকাশ তার কারণ স্বরূপ মহাকাশে বিলীন হয়। দেহের বায়ু মহাসমীরণে মিলিয়ে যায়, দেহস্থ তেজ মহাবৈশ্বানরে (আগুনে) প্রবিষ্ট হয়। দেহস্থিত জল জলাধারে চলে যায়। দেহস্থ জড় পদার্থসমূহ পৃথিবীর মাটিতে মিশে যায়। মৃত্যুকে যদি একটি ব্যষ্টিগত প্রলয় ধরা হয়। তা হলে প্রলয় একটি সমষ্টিগত মৃত্যু বা মূল কারণস্বরূপা প্রকৃতিতে প্রবেশমাত্র বলে ধরা যেতে পারে। আর এই প্রকৃতিও অবিনশ্বর এই কারণেই শুধু মানুষের আত্মাই অবিনশ্বর নয়। জীবনে ও মরণে মানুষ মাত্রেই অবিনশ্বর। মানুষ সম্পর্কে প্রাচ্য তথা ভারতীয় দর্শনের এই আবিষ্কার অভিনব তো বটেই, মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত এত বড় কথা আর কোনো দর্শনেই এযাবৎ বলা হয়নি। জীবন সম্পর্কে ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ-স্থিতি-সত্তা জাত এই উপলব্ধি বিজ্ঞান-চেতনার দ্বারা সমর্থিত ও পরিস্রুত।[৪০]

মাটি, জল, আগুন, বাতাস ও আকাশ এই পাঁচটি থেকে মানুষের দেহ নির্মিত হলে মৃত্যুর পর দেহ বিশ্লিষ্ট হয়ে এই পাঁচটি মহাভূতে ভাগ হয়ে যায়। 'পুঁইমাচা' গল্পের কিশোরী ক্ষেন্তির তার নিজের রোপণ করা নধর সুপুষ্ট পুঁইপাতাগুলির মধ্যে মৃত্যুর পর সে নিজে জীবনস্বরূপে আশ্রিত একথা বলাই যায়। শক্তির নিত্যতা সূত্রও বলে, শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই শুধুমাত্র রূপান্তর আছে। পুঁইপাতাগুলির মধ্যেই ক্ষেন্তির শরীর ও জীবনের নবতর রূপান্তর ঘটেছে। উপর্যুক্ত বক্তব্যের আলোকে, মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মধ্যকার যে বিপ্রতীপতা, ব্যবধান, দূরত্ব তা অনেকাংশে কমে এসেছে ফলে মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের পারস্পরিক সংহত যোগসূত্রের নবতর মাত্রা উন্মোচিত হয়েছে। মানুষের জীবনের সমগ্রতার সঙ্গে প্রকৃতি-চেতনা ও ঈশ্বর-ভাবনার সমসত্ত্ব মিশ্রণ তাঁর ছোটগল্পগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে।

৫

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে দুঃখ-যন্ত্রণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কৃতিত্ব-ব্যর্থতা, ক্লেদ-গ্লানির সমন্বয়ে প্রবহমান মানব জীবনের সামগ্রিকতাকেই ধারণ করেছেন। এখানে তিনি গণমানুষের ভেতরে তাদের অধিকারবোধ জাগিয়ে সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। মূলত তিনি জীবন রসিক শিল্পী। নির্মোহ, নির্লিপ্ত রসগ্রাহী হিসেবে মানবজীবনের বিচিত্র রসাস্বাদনই যেন তাঁর ছোটগল্প রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেখানে জীবনের বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে। মানবচরিত্রের নানা অভিজ্ঞতা তাঁর সজীব কল্পনার মিশ্রণে ছোটগল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। জীবনদৃষ্টির সুবিশাল পার্থক্য থাকলেও উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচনার বিষয়শৈলীর সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের সমধর্মিতা প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যে প্রকৃতি-প্রেম এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে প্রকৃতি-চেতনার মূলগত পার্থক্য হলো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির সাহচর্যে অর্জিত অনুভূতির সাহায্যে বিশ্বদেবতার কল্পনা করেছেন, আর বিভূতিভূষণ প্রকৃতির মোহনীয় রূপে শুধু মুগ্ধ ও আত্মতৃপ্তই হয়েছেন, কোনো সূক্ষ্মতর আকুতি প্রবল হয়ে ওঠেনি। মূলত অর্জিত জীবনাভিজ্ঞতা ও মৃদু কল্পনার মিশেলের পরিমিতিতে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের ভুবন। জীবনকে প্রকাশ ও গোপন করার এই আশ্চর্য পরিমিতিবোধ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মহৎ শিল্পীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর ছোটগল্পে মানুষের জীবনোপলব্ধি, প্রকৃতির সৌন্দর্য-চয়ন ও অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা আশ্চর্য গীতময়তায় একীভূত হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ২৩৩
২ Lal Ramji, *William Wordsworth Selected poems an evaluation of his poetry*, Aarti Book Centre, New Delhi, 1993, p. 44
৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৫৮০
৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ৫৫৮
৫ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৪র্থ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২২, পৃ. ৩২৬
৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৩১৩
৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৮
৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২৬৭
৯ তারকনাথ ঘোষ, *জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ*, আনন্দধারা প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৭৬, পৃ. ১০৯
১০ প্রমথনাথ বিশী, *রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ২৩
১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ*, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৮১
১২ সৈয়দ আকরম হোসেন, *প্রসঙ্গ : বাংলা কথাসাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩১
১৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৫৫৩
১৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৩
১৫ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৫৯৭
১৬ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপনিষদের দর্শন*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৯ (৪র্থ সংস্করণ), পৃ. ৮৭-৮৮
১৭ গোপিকানাথ রায় চৌধুরী, *বিভূতিভূষণ : মন ও শিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১২৩
১৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৪৬১
১৯ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২১১-২১২
২০ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ১৩১
২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৮
২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০০
২৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২৭০-২৭১
২৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯
২৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
২৬ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ২২৭
২৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০৪

২৮ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২৬৪

২৯ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (৬ষ্ঠ খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ৬৮৮

৩০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৫

৩১ চিত্তরঞ্জন ঘোষ, *বিভূতিভূষণ*, বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৬৬, পৃ. ১৬৮

৩২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ১৬৪

৩৩ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতি রচনাবলী* (১ম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ৩২৫

৩৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* (২য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৫২০-২১

৩৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২২

৩৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

৩৭ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬

৩৮ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৩

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৪

৪০ অর্ধেন্দু বিশ্বাস, *বিভূতিভূষণ: বিচার ও বিশ্লেষণ*, 'প্রকৃতিচেতনা ও বিভূতিভূষণের গল্প', সম্পাঃ পার্থজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতাঃ পাণ্ডুলিপি, ১৯৯২), পৃ. ১২৭-১২৮